শিক্ষার নব আদর্শ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে এদেশের চলতি শিক্ষার দর যাচাই করতে উদ্যত হয়েছেন, এ অতি সুখের কথা। কেননা, বাঙালি যদি কোনো বস্তু লাভ করবার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তো সে হচ্ছে শিক্ষা। সুতরাং আমরা দেশসুদ্ধ ভদ্রসন্তান প্রাণপাত করে যা পাই, জহুরির কাছে তার মূল্য যে কি, তা জানায় ক্ষতি নেই।

আমরা যে কত শিক্ষালোভী, তার প্রমাণ আমাদের পাঁচ বৎসর বয়েসে হাতে-খড়ি হয়। আর কম্‌সে-কম একুশ বৎসর বয়েসে হাতে-কালি মুখে-কালি আমরা সেনেট-হাউস থেকে লিখে আসি। কিন্তু এতেও আমাদের শিক্ষার সাধ মেটে না। এর পরে আমরা সারাজীবন যখন যা-কিছু পড়ি— তা কবিতাই হোক আর গল্পই হোক— আমাদের মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, আমরা এ পড়ে কি শিক্ষা লাভ করলুম। এ প্রশ্নের উত্তর মুখে-মুখে দেওয়া অসম্ভব; কেননা, সাহিত্যের যা শিক্ষা, তা হাতে-হাতে পাওয়া যায় না। সাহিত্য যা দেয়, তা আনন্দ; কিন্তু ও-বস্তু আমরা জানি নে বলে মানি নে। আমাদের শিক্ষার ভিতর আনন্দ নেই ব'লে আনন্দের ভিতর যে শিক্ষা থাকতে পারে, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

ফলে, পাঠকমাত্রই যখন শিক্ষার্থী, তখন লেখকমাত্রকেই দায়ে-পড়ে শিক্ষক হতে হয়। পাঠকসমাজ যখন আমাদের কাছে শিক্ষা নিতে প্রস্তুত, তখন অবশ্য শিক্ষা দিতে আমাদের নারাজ হওয়া উচিত নয়; কেননা, লেক্‌চার-জিনিসটে দেওয়া সহজ, শোনাই কঠিন। তবে যে আমরা পাঠকদের সকল সময় শিক্ষা না দিয়ে সময়-সময় আনন্দ দেবার বৃথা চেষ্টা করে তাঁদের বিরাগভাজন হই, তার একটি বিশেষ কারণ আছে।

বাংলাসাহিত্যের যে শুধু পাঠক আছেন তা নয়, পাঠিকাও আছেন। দলে বোধ হয় উভয়েই সমান পুরু হবেন, অথচ এ উভয়ের ভিতর বিদ্যার প্রভেদ বিস্তর। পাঠকেরা-সব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ; পাঠিকারা বালিকা-বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণাও নন। সুতরাং পাঠকদের জন্য লেখকদের পোস্ট-গ্রাজুয়েট লেক্‌চার দেওয়া কর্তব্য, এবং পাঠিকাদের জন্য নিম্ন-প্রাইমারির। অথচ শ্রোতাদের শিক্ষা দিতে হলে আমাদের পক্ষে সেইরূপ বক্তৃতা করা আবশ্যক যা সকলের পক্ষে সমান উপযোগী হয়। অসাধ্যসাধন করবার দুঃসাহস সকলের নেই, সম্ভবত সেই কারণে বাংলার কাব্যসাহিত্য শিক্ষাদানের ভার হাতে নেয় নি।

কিন্তু এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের পক্ষে সমান শিক্ষাপ্রদ সাহিত্য যে

রচনা করা যায় না, এ ধারণা অমূলক। উপর-উপর দেখলেই এদেশের শিক্ষিত লোক এবং অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের বিদ্যাবুদ্ধির প্রভেদ মস্ত দেখায়; কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, আমরা মনে সকলেই এক। মনোরাজ্যে যে আমাদের লিঙ্গভেদ নেই, বর্ণভেদ নেই, বয়োভেদ নেই— তার প্রমাণ হাতে-কলমে দেখানো যেতে পারে। 'ঘরেবাইরে' লেখবার কৈফিয়ত তলব করে একটি ভদ্রমহিলা রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখেছিলেন, তা যে-কোনো এম. এ. পাস-করা প্রোফেসর লিখতে পারতেন, এবং উক্ত গল্প পাঠ করে একটি এম. এ. পাস-করা প্রোফেসরের মনে যে সমস্যার উদয় হয়েছে, তা যে-কোনো ভদ্রমহিলার মনে উদয় হতে পারত। অতএব যে-কোনো শিকারী-সাহিত্যিক একটি বাক্য-বাণে এ দুটি পাখিকেই বিদ্ধ করতে পারেন। বস্তুগত্যা আমাদের মন হচ্ছে হরীতকী-জাতীয়; শিক্ষার গুণে সে মন পাকে না, শুধু শুকিয়ে যায়। সুতরাং বাংলার অশিক্ষিত স্ত্রীলোক ও শিক্ষিত পুরুষ— এ দুয়ের মনের ভিতর প্রভেদ এই যে, এর একটি কাঁচা আর অপরটি শুকনো। দেশসুদ্ধ লোক সেই শিক্ষা চান, যে শিক্ষার গুণে স্ত্রীপুরুষ সকলের মন সমান শুকিয়ে ওঠে। কেননা, হরীতকী যত বেশি শুকোয়, যত বেশি তিতো হয়, তত বেশি উপকারী হয়। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ সেই শিক্ষার সন্ধানে ফিরছেন, যে শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মন-হরীতকী পেকে উঠবে, এবং যার আস্বাদ গ্রহণ করে স্বজাতি অমরত্ব লাভ করবে। এক্ষেত্রে দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের মিল হবার কোনো সম্ভাবনা নেই; কেননা, উভয়ের আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

আমাদের পক্ষে কি শিক্ষা ভালো, তা নির্ণয় করবার পূর্বে— আমরা কি হতে চাই, সেবিষয়ে মনঃস্থির করা আবশ্যক। কেননা, একটা স্পষ্ট জাতীয় আদর্শ না থাকলে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে না। ধরুন, যদি অশ্বত্ব-লাভ-করা গর্দভদের জাতীয় আদর্শ করে তোলা যায়, তা হলে অবশ্য সে জাতির শিক্ষকেরাও তাদের জন্য পেটনের ব্যবস্থা করবেন; অপরপক্ষে গর্দভত্ব লাভ করা যদি অশ্বদের জাতীয় আদর্শ করে তোলা যায়, তা হলে সে জাতির শিক্ষকেরাও তাদের জন্য ঐ পেটনেরই ব্যবস্থা করবেন। হয় গাধা-পিটে-ঘোড়া, নয় ঘোড়া-পিটে-গাধা করাই যে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য— সাধারণত এইটেই হচ্ছে লোকের ধারণা। এবং আমরা এই উভয়ের মধ্যে যে কোন্ জাতীয়, সেবিষয়ে দেশে-বিদেশে বিষম মতভেদ থাকলেও পেটন দেওয়াটাই যে শিক্ষা দেবার একমাত্র পদ্ধতি, সেবিষয়ে বিশেষ-কোনো মতভেদ নেই। কাজেই আমাদের শিক্ষকেরা এক হাতে সংস্কৃত, আর-এক হাতে ইংরেজি ধরে আমাদের উপর দু হাতে চাবুক চালাচ্ছেন। এর ফলে কত গাধা ঘোড়া এবং কত

ঘোড়া গাধা হচ্ছে— তা বলা কঠিন ; কেননা, এবিষয়ের কোনো স্ট্যাটিস্টিক্‌স্‌ অদ্যাবধি সংগ্রহ করা হয় নি।

সে যাই হোক, যে জাতীয় আদর্শের উপর জাতীয় শিক্ষা নির্ভর করে, তা যুগপৎ মনের এবং জীবনের আদর্শ হওয়া দরকার। যেদেশের জাতীয় শিক্ষা আছে, সেদেশের প্রতি ঈষৎ দৃষ্টিপাত করলেই এ সত্য সকলের কাছেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। ইউরোপে আমরা দেখতে পাই যে জর্মানি চেয়েছিল 'যা নই তাই হব', ইংলণ্ড 'যা আছি তাই থাকব', আর ফ্রান্স 'যা আছি তাও থাকব না, যা নই তাও হব না' ; এবং এই তিন দেশের গত পঞ্চাশ বৎসরের কাজ ও কথার ভিতর নিজ-নিজ জাতীয় আদর্শের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে।

কিন্তু আমাদের বিশেষত্ব এই যে, আমরা জীবনে এক পথে চলতে চাই— মনে আর-এক পথে।

আমাদের ব্যক্তিগত মনের আদর্শ হচ্ছে 'যা ছিলুম তাই হওয়া', আর আমাদের জাতিগত জীবনের আদর্শ হচ্ছে 'যা ছিলুম না তাই হওয়া'। ফলে আমাদের সামাজিক বুদ্ধির মুখ প্রাচীন ভারতবর্ষের দিকে আর আমাদের রাষ্ট্রীয় বুদ্ধির মুখ নবীন ইউরোপের দিকে। এই আদর্শের উভয়সংকটে প'ড়ে আমরা শিক্ষার একটা সুপথ ধরতে পারছি নে— স্কুলেও নয়, সাহিত্যেও নয়।

একজন ইংরেজ দার্শনিক বলেছেন যে, সমস্যাটা যে কি এবং কোথায়, সেইটে ধরাই কঠিন ; তার মীমাংসা করা সহজ। একথা সত্য। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ তাই 'ঘরেবাইরে'য় আমাদের জাতীয় সমস্যার ছবি এঁকেছেন ; কেননা, ও-উপন্যাসখানি একটি রূপক-কাব্য ছাড়া আর-কিছুই নয়। নিখিলেশ হচ্ছেন প্রাচীন ভারতবর্ষ, সন্দীপ নবীন ইউরোপ, আর বিমলা বর্তমান ভারত। এই দোটানার ভিতর পড়েই বিমলা বেচারা নাস্তানাবুদ হচ্ছে, মুক্তির পথ যে কোন্‌ দিকে, তা সে খুঁজে পাচ্ছে না। এরূপ অবস্থায় এক সৎশিক্ষা ব্যতীত তার উদ্ধারের উপায়ান্তর নেই। অতএব এক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে শিক্ষার একটি আদর্শ খুঁজে-পেতে বার করা দরকার।

আমি বহু গবেষণার ফলেও সে আদর্শ আজও আবিষ্কার করতে পারি নি, সুতরাং সে আদর্শ নিজেই গড়তে বাধ্য হয়েছি। আমি স্বজাতিকে অনুরোধ করি যে, আমার এই গড়া আদর্শ যেন বিনা পরীক্ষায় পরিহার না করেন।

শ্রীমতী লীলা মিত্র নামক জনৈক ভদ্রমহিলা 'সবুজপত্রে' এই মত প্রকাশ করেন যে, এদেশে স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ ভুল, সুতরাং তার পদ্ধতিও নিরর্থক। তাঁর মতে আমরা স্ত্রীজাতিকে সেই শিক্ষা দিতে চাই, যাতে তারা পুরুষজাতির কাজে লাগে, সুতরাং সে

শিক্ষা নিষ্ফল। একথা সম্ভবত সত্য। তিনি চান যে স্ত্রীজাতি নিজের শিক্ষার ভার নিজ-হস্তে গ্রহণ করেন। এ হলে তো আমরা বাঁচি। আমাদের মেয়েরা যদি নিজের বিবাহের ভার নিজের হাতে নেন, তা হলে দেশসুদ্ধ লোক যেমন কন্যাদায় হতে অমনি নিষ্কৃতি লাভ করে, তেমনি মা-লক্ষ্মীরা যদি নিজ-গুণে মা-সরস্বতী হয়ে ওঠেন, তা হলে স্ত্রীশিক্ষার সমস্যা আমাদের আর মীমাংসা করতে হয় না।

সে যাই হোক, আমি বলি, পুরুষজাতিকে সেই শিক্ষা দেওয়া হোক, যাতে তারা স্ত্রীজাতির কাজে লাগে। শিক্ষার এ আদর্শ কোনো কালে কোনো দেশে ছিল না বলেই আমাদের পক্ষে তা গ্রাহ্য করা উচিত। পুরুষজাতি যদি এই আদর্শে শিক্ষিত হয়, তা হলে আর-কিছু না হোক, পৃথিবীর মারামারি-কাটাকাটি সব থেমে যাবে। নিখিলেশ ও সন্দীপ যদি বিমলাকে নিজের নিজের কাজে লাগাতে চেষ্টা না ক'রে নিজেদের বিমলার কাজে লাগাতে চেষ্টা করতেন, তা হলে গোল তো সব মিটেই যেত। অতএব আমরা যাতে বিমলার কাজে লাগি, সেইরকম আমাদের শিক্ষা হওয়া কর্তব্য।

মাঘ ১৩২২

কন্‌গ্রেসের আইডিয়াল

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই-বন্দরে কন্‌গ্রেসের জন্ম হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা-শহরে তা সাবালক হয়। তার পরবৎসর সুরাট-নগরীতে তার মৃত্যু হয়। এ বৎসর আবার তার জন্মস্থানে তার পুনর্জন্ম হয়েছে।

এবার কিন্তু কন্‌গ্রেসের ধড়ে প্রাণ আসে নি তার প্রাণে ধড় এসেছে। সকলেই জানেন, সুরাটে কন্‌গ্রেসের মৃত্যু হয় নি, তার অপমৃত্যু ঘটেছিল; আর সে যেমন-তেমন অপমৃত্যু নয়— একসঙ্গে খুন এবং আত্মহত্যা। এদেশে কারও অপমৃত্যু ঘটলে তার আত্মার ততদিন সদ্‌গতি হয় না, যতদিন-না তা আবার একটি নূতন দেহে প্রবেশলাভ করতে পারে। কন্‌গ্রেসের সূক্ষ্ম শরীর তাই এই কয় বৎসর একটি স্থূল শরীরের তল্লাসে এদেশে-ওদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, অতঃপর বোম্বাই-ধামে তা লাভ করেছে। গত কন্‌গ্রেসে বিশ হাজার লোক জমায়েত হয়েছিল।

কন্‌গ্রেসওয়ালাদের মতে কিন্তু কন্‌গ্রেসের কস্মিনকালেও মৃত্যু হয় নি; সুরাটে শুধু স্বরাট পাগল হয়ে কন্‌গ্রেসকে জখম ক'রে নিজে করেছিলেন আত্মহত্যা। তার পর, যেহেতু সে স্বরাট কন্‌গ্রেসেই জন্মলাভ করেছিল, সেইজন্য তার ভূত তার জন্মদাতার স্কন্ধে ভর করবার চেষ্টায় ফিরছিল। সেই ভূতের ভয়ে কন্‌গ্রেস এতদিন ঘরের দুয়োর বন্ধ করে বসেছিল। এই বন্ধ ঘরের দূষিত বায়ুতেই তার শরীর কাহিল হয়ে গিয়েছিল। অথচ কন্‌গ্রেস এই ভূতের উপদ্রব থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোনো উপায় বার করতে পারে নি। এবার নবমন্ত্রের বলে স্বরাটের ভূত, ভবিষ্যৎ হয়ে গেছে। তাই কন্‌গ্রেসের দেহটি আবার নাদুশনুদুশ হয়ে উঠেছে। এককথায় কন্‌গ্রেস এবার বেঁচে ওঠে নি, বেঁচে গিয়েছে।

সে যাই হোক, কন্‌গ্রেসের এবার ভোল ফিরেছে এবং সেই সঙ্গে তার বোল ফিরেছে। এতদিন কন্‌গ্রেস ছিল বড়দিনের দুর্গোৎসব; তিনদিন ধরে 'ধনং দেহি মানং দেহি' বলে দু'সন্ধ্যা ইংরেজিতে মন্ত্র আওড়ানো এবং সেই উপলক্ষে খানা-পিনা নাচ-তামাশা আমোদ-আহ্লাদ, এবং তার পরে বিসর্জন, এবং তার পরে কন্‌গ্রেস-ওয়ালাদের পরস্পর-কোলাকুলি করে গৃহাভিমুখে যাত্রা— এই ছিল কন্‌গ্রেসের হাল ও চাল।

ভবিষ্যতে শুনছি কন্‌গ্রেসের সপ্তমী অষ্টমী নবমী থাকবে, কিন্তু দশমীতেই সব শেষ হবে না। তার পর বারোমাস ধরে কন্‌গ্রেস তার স্বধর্ম প্রচার করবে। অর্থাৎ কন্‌গ্রেস এবার জাতীয়-রাজনৈতিক-শিক্ষা-পরিষদে পরিণত হল। কন্‌গ্রেসের এ সংকল্প

অতি সাধুসংকল্প সন্দেহ নেই ; কিন্তু যেবিষয়ে সন্দেহ আছে তা হচ্ছে এই যে, এ সংকল্প কার্যে পরিণত হবে কি না।

প্রথমত রাজনীতি বলতে যা বোঝায়, তা দেশসুদ্ধ লোককে বোঝানো কঠিন। ও-পদার্থ আমরা ইউরোপ থেকে আমদানি করেছি। সেদেশে একালে ও-বস্তু হচ্ছে তাই, যার ভিতর একদিক দিয়ে দেখতে গেলে রাজাও নেই, নীতিও নেই ; আবার আর-একদিক দিয়ে দেখতে গেলে, ও-দুইই আছে। এই দুটো দিক যাতে একসঙ্গে চোখে পড়ে, এমন করে দেশের চোখ-ফোটানোর জন্য যে জ্ঞানাঞ্জনশলাকার আবশ্যক, তা দেশীভাষা নয়। ব্রহ্ম যে একাধারে সগুণ এবং নির্গুণ, এ সত্য বোঝাতে হলে যেমন সংস্কৃতভাষার সাহায্য চাই— তেমনি রাজনীতি যে একসঙ্গে রাজমন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র হতে পারে, এ সত্য বোঝাতে হলে ইংরেজির সাহায্য চাই।

কন্‌গ্রেস অবশ্য এতে পিছপাও হবে না। কেননা, কন্‌গ্রেসের পাণ্ডারা ঐ এক ইংরেজিভাষাই জানেন, এবং ঐ এক ইংরেজিভাষাই মানেন। তবে তাঁদের কথা বোঝে, এমন লোক দেশে ক'টি। অতএব তাঁরা যদি দেশকে রাজনৈতিক-শিক্ষা দিতে বসেন তো ফলে দাঁড়াবে এই যে, কন্‌গ্রেসওয়ালারাই পালা করে পরস্পর-পরস্পরের গুরু-শিষ্য হবেন। সুতরাং যতদিন-না ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি লোক ইংরেজি-শিক্ষিত হয়ে ওঠে, ততদিন এই রাজনৈতিক-শিক্ষার কার্যটা মুলতবি রাখাই কর্তব্য। সে শিক্ষা যে শুধু নিষ্ফল হবে তাই নয়, তার কুফলও হতে পারে। শিক্ষা দিতে গিয়ে হয়তো কন্‌গ্রেসকে দু দিন পরে দেশের লোককে বলতে হবে— 'উলটা বুঝিলি রাম'। এ বিপদ যে আছে, তার প্রমাণও আছে। আর এরূপ উলটা বোঝাটা রামের পক্ষে আরামের নয়। এবং সে অবস্থায় কন্‌গ্রেসের পক্ষে তাকে ভ্যাবাগঙ্গারাম বলাটাও সংগত নয়।

দ্বিতীয়ত, জাতীয় রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য একটা জাতীয় রাজনৈতিক আদর্শ থাকা আবশ্যক। একটা আইডিয়াল যে থাকা চাইই চাই, একথা কন্‌গ্রেসও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। এস্থলে যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, কন্‌গ্রেস কি আজও তেমন-কোনো রাজনৈতিক আদর্শের সন্ধান পেয়েছেন? তা হলে কন্‌গ্রেসওয়ালারা উচ্চকণ্ঠে উত্তর দেবেন, অবশ্য পেয়েছি। এবং সে আদর্শের নাম হচ্ছে, 'সাম্রাজ্যের ভিতর স্বরাজ্য'।

নিত্য দেখতে পাই যে, এক দলের মতে ভারতবর্ষে স্বরাজকতার অর্থ হচ্ছে অরাজকতা, আর-এক দলের মতে অরাজকতার অর্থই হচ্ছে স্বরাজকতা। এই দুটি হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক-গগনের শুক্ল আর কৃষ্ণ পক্ষ। কন্‌গ্রেস অবশ্য এই দুই

মতই সমান অগ্রাহ্য করেন ; কেননা, এই দুয়ের মধ্যস্থ দল হচ্ছে কন্‌গ্রেস। এ মতে শুদ্ধ-স্বরাজ্য সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ হতে পারে, কিন্তু 'সাম্রাজ্যের ভিতর স্বরাজ্য'-সম্বন্ধে হতে পারে না। কেননা, সাম্রাজ্যের ভিতর স্বরাজ্য যে খাপ খাওয়ানো যেতে পারে, তার উদাহরণ ক্যানাডা অস্ট্রেলিয়া সাউথ-আফ্রিকা প্রভৃতি। সুতরাং যার এত নজির আছে, সেই আদর্শের পক্ষে ওকালতি করায় বাধা নেই ; অতএব এ আদর্শ বিদ্যাসংগতও বটে, বুদ্ধিসংগতও বটে, কেননা, যদি বর্তমানের উপাদান নিয়ে ভবিষ্যতের মূর্তি গড়তে হয়, তা হলে এছাড়া অন্য-কোনো আদর্শ হতে পারে না। তবে এই আদর্শকে বিপক্ষ-পক্ষ হেসে এই প্রশ্ন করেন যে—

'তুমি কোন্ গগনের ফুল,
তুমি কোন্ বামনের চাঁদ'

এর উত্তরে স্বয়ং প্রশ্নকর্তাই বলেন যে, আদর্শ ইংরেজি-শিক্ষিত ভারতবর্ষের চিদ্-আকাশের ফুল এবং ইংরেজি-শিক্ষিত ভারতবর্ষের অমাবস্যার চাঁদ।

একথা শুনে কন্‌গ্রেস বলেন, এ ভবিষ্যতের আদর্শ এবং সে ভবিষ্যৎও এত দূর-ভবিষ্যৎ যে, বর্তমানের ধুলো যাঁদের চোখে ঢুকেছে, সেইসকল অন্ধলোকেই এর সাক্ষাৎ পান না বলে এর অস্তিত্বেও বিশ্বাস করেন না। এ আদর্শ ভারতবর্ষের কল্পনার ধন। এ তো হাতে নাগাল পাবার জিনিস নয়, মনশ্চক্ষে দূরবীন ক'ষে এ আদর্শ দেখতে হয়। কন্‌গ্রেসের সকল বাণীই যে ভবিষ্যদ্বাণী, এ জ্ঞান থাকলে বিপক্ষ-পক্ষ কন্‌গ্রেসের কথা শুনে আর হাসত না।

ভবিষ্যতে কি হতে পারে আর না হতে পারে, সেবিষয়ে ত্রিকালজ্ঞ স্বয়ং ভগবান ছাড়া আর কেউ কিছু বলতে পারেন না। সুতরাং দূর-ভবিষ্যতে যে ঐ আদর্শ-চাঁদ ভারতবাসীর হাতে আসবে না এবং তাদের মাথায় ঐ আকাশকুসুমের পুষ্পবৃষ্টি হবে না— একথা জোর করে কে বলতে পারে। তবে এখন ঐ চাঁদকে ডেকে 'আয় আয় আমাদের মাথায় টী দিয়ে যা', আর ঐ আকাশকুসুমকে ডেকে 'যেখানে আছ সেইখানে থাকো, দেখো যেন ঝরে আমাদের গায়ে পড়ো না'— একথা বলা ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নেই। কেননা, বেশি আলোয় আমাদের চোখ ঝল্‌সে যায়, আর আমরা ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাই।

তবে কথা হচ্ছে এই যে, বর্তমানকে আমরা একেবারেই উপেক্ষা করতে পারি নে, কেননা এ পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যা সম্বন্ধ তা বর্তমানেরই সম্বন্ধ। 'চোখ বুজলেই অন্ধকার'— এ প্রবাদ তো সকলেই জানেন। সুতরাং আমাদের খোলা চোখের জন্যও একটা আদর্শ থাকা দরকার। আমরা চাই সেই ফুল, যার দ্বারা মা'র নিত্যপূজা